সুকুমার সেনের ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’

জাহিল হাসান

বাংলার রূপ পৃথিবীর রূপের মতোই বহুবিধ, নানান বৈচিত্র্যে ভরা। অনুরূপ বিভিন্নতা বাঙালির মুখেরও। এভাবে বললে কথাটা মানতে হয়তো অসুবিধা হয় না। কিন্তু কার্যত বাঙালির কথা ভাবলে যে ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা মোটেই বহুমাত্রিক নয়। ঠিক যেমন আমরা বাংলার ছবি আঁকি নদীবেষ্টিত শস্যশ্যামল হরিৎ প্রান্তর কল্পনা করে, তেমনি বাঙালিরও এক অদ্বিতীয় প্রতিচ্ছবি বহুদিন ধরে আমাদের মনের মধ্যে গ্রথিত আছে। গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, শিক্ষিত চেহারা এবং তার পটভূমিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, দুর্গোৎসব, ভ্রমণ, বামপন্থী রাজনীতি, লিটল ম্যাগাজিন, বইমেলা ইত্যাদি যা কিছু ওই বাঙালি আর্কিটাইপের সঙ্গে মেলে। অর্থাৎ, এক বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ। ভদ্রলোক, চিসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান, প্রগতিশীল, উদারমনস্ক। কিন্তু এই সব গুণ একত্র করেও কি বাঙালির সম্পূর্ণ চেহারা পাওয়া যায়? গড়িয়াহাট-পার্কসার্কাস-শ্যামবাজার-মেটিয়াব্রুজ-বড়োবাজার-উলুবেড়িয়া-বসিরহাট-সুন্দরবন-শান্তিনিকেতন-কান্দি-পাণ্ডুয়া-গোপীবল্লভপুর-সোনামুখী-মানবাজার-ফাঁসিদেওয়া-দিনহাটা-গাজোল-মিরিক থেকে ত্রশ-সেকশন নিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখুন এই ছবির সঙ্গে মেলে কি না! বাঙালির কীভাবে সংজ্ঞা-নির্ধারণ করা হবে? যদি সব ছেড়ে শুধু মাতৃভাষাকেই ধরা হয়, তা হলেও সহজে মীমাংসা হবার নয়। এই রাজ্যের মানুষ কত রকম ভাষায় কথা বলে। ওইসব ভাষার মধ্যে আবার কত উপভাষা, আঞ্চলিক তারতম্য। সুতরাং কী বাংলা, কী বাঙালি, কী বাংলা-ভাষা আর কী বাংলা সাহিত্য, কারোরই কোনও অখণ্ড অবিমিশ্র অনাপেক্ষিক সত্তা হতে পারে না! যেটা চালু আছে সেটা চাপানো, বানানো, ছাঁচে-তৈরী, একচেটিয়া, একপেশে, একমাত্রিক, এক-রঙা এক ছবি। এর বাইরেও যে বহু এলাকা থাকতে পারে, তা খুঁজে দেখার প্রয়োজন বোধ করছেন এ যুগের নতুন চিন্তার মানুষেরা, যেমন এই লেখার শুতে যাঁর উল্লেখ করেছি। যে-কোনও ব্যাপারে বেশি আলো পড়ে তার কেন্দ্রের দিকে, উপেক্ষিত হয় চর্তুপার্শ্বর ধূসর এলাকাগুলি। এই জাতীয় চিন্তা যা পোস্ট-মডার্নিজমের নামে এখন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে, কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তকেও সমগুত্ব দেওয়ার কথা বলে।

সুকুমার সেন যখন তাঁর ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’ লিখেছিলেন আজ থেকে একান্ন বছর আগে, তখন কিন্তু এ ধরণের কোনও ভাবনা-চিন্তার জন্ম হয় নি। বরং সদ্য দেশভাগের পরে এ জাতীয় কাজে ঝুঁকি ছিল, ঝোঁক ছিল না। তা হলেও, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ প্রথম খণ্ড লেখার পর তাঁর মনে হয়েছিল, ‘অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় যে সাহিত্যধারা একদা বাঙালী জনগণের একটা বৃহৎ অংশের রসপিপাসা মেটাত’, তার কথা আগাগোড়া বলা সম্ভব হয় নি ওই গ্রন্থে এবং সে ত্রুটি শোধরানো দরকার।

নবতিপর আচার্যের শেষ বয়সে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন মহীদাস ভট্টাচার্য। তিনি এখন রাজ্যের বাইরে দক্ষিণতম প্রান্তে এক ভাষাতত্ত্ব-সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থায় শিক্ষা ও গবেষণাকার্যে নিযুক্ত। অমায়িক, নির্বিরোধী মানুষ। কিছুদিন আগে সুকুমার সেনের জন্মশতবর্ষ চলাকালে এই লেখকের অনুরোধে তিনি একটি লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর গু সম্পর্কে লিখেছিলেন। স্মৃতিভিত্তিক লেখা হলেও তাতে ইসলামি সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু বিতর্ক উসকে দেওয়া মন্তব্য ছিল। প্রফেসার সেনের প্রতি

শ্রদ্ধায় অবিচল থেকেও যে সংশয় তাঁকে ঘিরে ধরেছিল তা হচ্ছে, 'ইসলামি সাহিত্যের ওপর প্রফেসার সেনের একটা বই আছে। আমাদের বহুধার্মিক ও বহুভাষিক সমাজে পরস্পরের অবদানের সাক্ষ্য হিসেবে এই জাতীয় রচনাগুলি জরি। আব ার শিল্প-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিষয়ই মুখ্য। — সেখানে বিষয়ীকে আমরা যে কখনো টেনে আনি না, তা নয়। তবে তাঁর জা তি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি আশ্রয় করে শিল্পের প্রাঙ্গণকে সংকুচিত বা বিভাজিত করব কি না, সে নিয়ে একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে ফিরে বেড়াত এবং প্রফেসর সেনের এই বিভাজন সম্পর্কে একটা ভাবনা উঁকি দিয়ে যেত। — যদি সাহিত্যের বিষয় হত ইসলাম তা হলে এক। কিন্তু বিষয়ীর ধর্ম ইসলাম বলে একটা পৃথক অংশ না থাকাই ভালো। শেষের কথাটুকু 'বাংলা সা হিত্যের ইতিহাস'-এ 'মুসলমান কবিদের অবদান' শিরোনামে লিখিত অংশ প্রসঙ্গে উচ্চারিত। তবে মহীদাস স্বীকার করেছেন, 'ইসলামী সাহিত্যের ওপর বইটি পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার একটা সাক্ষ্য এবং সুকুমার সেন 'জাতি-ধর্মজনিত চিত্তের দীনতার ঊর্দ্ধে থাকার চেষ্টা করেছেন আমৃত্যু।' এ সমস্ত কথাই মহীদাস বলেছেন সদুদ্দেশ্যে, তা হলেও তঁ ার মন থেকে সংশয় যায়নি কারণ তিনি বিষয়টি বিচার করেছেন অনপেক্ষ ধারণা নিয়ে।

এই প্রশ্ন আরও অনেকের মনে জেগেছে, বিশেষ করে যখন বইটি প্রথম বেরিয়েছিল। বইয়ের এই নাম নিয়ে যে বিতর্ক উঠতে পারে, সে সম্পর্কে লেখক প্রথম থেকেই সজাগ ছিলেন। হয়তো ছাপার আগেই এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাই কৈফিয়ত দিয়েছেন প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই। প্রায় আত্মরক্ষার ঢঙে লেখা তাঁর প্রথম ভূমিকা লিপি, 'ইসলামি' নামটি হয়ত সঙ্গত নয়, কেননা রচনা-রচয়িতা-ভাব-ভাষা কোন দিক দিয়েই এই সাহিত্যকে সর্বথা ইসল ামি বলা যায় না। আর ইসলাম শাস্ত্র ও তত্ত্ববিষয়ক নিবন্ধ ছাড়া অপর রচনার পাঠক ও শ্রোতা মুসলমান-সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না।' তা সত্ত্বেও যে কেন এই নাম ব্যবহার করলেন, তার জবাব খুঁজতে হলে পড়তে হবে তাঁর বাইশ বছর পরে লেখা দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য। এই জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন হয়েছিল কারণ, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ''ইসলামি ব াংলা সাহিত্য'' প্রকাশিত হবার পরে কোন একটি পত্রিকায় নামটির দোষ ধরা হয়েছিল।' সেবারও তিনি রক্ষণাত্মক, 'যঁ াদের রচনা বইটিতে আলোচিত হয়েছে, তাঁদেরই কেউ কেউ ''এছলামি বাঙ্গ অলা'' নামটি ব্যবহার করেছিলেন। আমি ''এছলামি'' শব্দটিকে স্বাভাবিকভাবেই ''ইসলামি'' করে নিয়েছি। তাতে এমন কী দোষ হয়েছিল, তা এখনও বুঝতে পারছি না।' এতখানি রক্ষণাত্মক হবার কারণ এ নয় যে তাঁর মনে নিজের কাজ সম্পর্কে প্রত্যয়ের অভাব ছিল। জবাবদিহির ধরন দেখলেই বোঝা যায় যে নানা মহল থেকে সমালোচিত হচ্ছিলেন তিনি বইয়ের এই ধরণের নামের জন্য।

জীবনের মতো সাহিত্যও এক বৃহৎ মোজেইক। দূর থেকে দেখলে তাকে একরকম মনে হয় আর ক্লোজ-আপে দেখলে অন্যরকম। কোনও বিষয়ের যে গুণ সবচেয়ে প্রবল, সেটাই আধিপত্য করে তাতে এবং বিহঙ্গদৃষ্টিতে তার বাইরে আর কিছু চোখে পড়ে না। এই জন্য সময়ে-সময়ে বিষয়কে বিশেষিত করে দেখারও প্রয়োজন হয় । যেমন দলিতসাহিত্য, মহিলা ঔপন্যাসিক, কৃষ্ণাঙ্গদের কবিতা, ভারতীয় লেখকদের রচিত ইংরেজি সাহিত্য, ধর্মভিত্তিক কবিতা ইত্যাদি। অতএব সুকুম ার সেন কোনও ভুল করেননি ইসলামি বাংলা সাহিত্য বা মুসলমান কবিদের অবদান সম্পর্কে লিখে। বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যাধিক অংশের মানুষের নিজেদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য জানা উচিত এই ভুলে যাওয়া পুরনো ইতিহাস। আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের যে প্রবল উপস্থিতি ছিল, ব্রিটিশ আসার পর তা একেবারে ক্ষীণ হয়ে যায়। মুসলমান যে ভালো বাংলা লিখতে বা বলতে পারে, এটাই তখন মানুষ ভুলতে বসেছিল। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে মীর মশাররাফ হোসেনের মতো যাঁরা বাংলা গদ্য লিখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের লেখা পড়ে অনেকেই অবাক হয়ে যেতেন। প্রায় চার দশক লেখালেখির পরও মশার্‌রফকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি তদ ানীন্তন বুদ্ধিজীবীবর্গ। তাঁর 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' সম্পর্কে বালখিল্যসুলভ মন্তব্য করেছিল (অক্টোবর ১৯০০) — আজও এ বঙ্গে মুসলমানকে বাঙালি বলে স্বীকার করায় মানসিক কুণ্ঠা আছে (মুসলমান নাম শুনেই প্রথমে মনে হয় বুঝি অবাঙা লি বা বাংলাদেশ থেকে আগত)। অথচ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের শুতেও মুসলমান গদ্যলেখকরা অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করতেন এবং আরবি-ফারসির যথেচ্ছ মিশ্রণ — ইসলামি বাংলা বলতে যা ভাবা হয়, তা পাওয়া যায় না তাঁদের লেখায়। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস তো জল নিয়েই লেখা। চাইলে মশার্‌রাফ জলের বদলে পানি

বলতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি। তবু তো 'বিষাদ-সিন্ধু'র পাঠক হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত। মোহম্মদ নজিবর রহমানের বহুল-পঠিত উপন্যাস আনোয়ার (১৯১৪)-র কথা অধিকাংশ হিন্দু পাঠক বোধহয় শোনেনওনি। অর্থাৎ যে গ্রন্থের লেখক মুসলমান, পাঠকও মুসলমান, তারও ভাষা কেমন দেখুন — 'ভাদ্রমাসের ভোর বেলায়। স্বর্গের ঊষা মর্তে নামিয়া ঘরে ঘরে শান্তি বিলাইতেছে। তাহার অমিয় কিরণে মেদিনী-গগনে হেমার্ভ বর্ণে রঙ্গিত হইয়াছে। কেবল গদ্য নয়, কবিতাতেও বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোতের মধ্যেই ছিলেন তখনকার মুসলিম কবিরা, সমসাময়িকদের মতো তাঁরাও একইভাবে রবীন্দ্র প্রভাবিত। এমনকি 'ঈদ-উৎসব'-এর মতো কবিতাতেও গোলাম মোস্তাফা যিনি সাধারণত গোঁড়া মুসলিম কবি হিসেবেই বিবেচিত বিশুদ্ধ তৎসম বাংলায় লিখেছেন — "আজিকে আমাদের জাতীয় মিলনের পুণ্য দিবসের প্রভাতে/কে গো ঐ দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া সবাকারে ফিরিছে বিশ্বের সভাতে।' নজলের আর্বিভাবের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের বাগ্‌ধারা পালটে যেতে লাগল। শুধু যে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটল তা-ই নয়, ইংরেজ-প্রভাবিত শিষ্টতার বাতিকে যে-লোকজ শব্দগুলি সাহিত্যে প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিও পুনর্প্রবেশ পেল।

যে-আমলের কথা সুকুমার সেন লিখেছেন, তখনও কিন্তু 'মুসলমান লেখকেরা সাহিত্যে যে ভাষা ব্যবহার করতেন, তা ছিল সাধুভাষা। তবে তার মধ্যে অল্পবিস্তর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ছিল। এই সকল শব্দের কতকগুলি মুসলমান জনগণেরই সুপরিচিত, বাকিগুলি তখনকার হিন্দু-মুসলমানের কাজের ভাষার সাধারণ সম্পত্তি ছিল।' এমনকি পদরচনাতেও আরবি-ফারসি মেশানো ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় কর্তাভজাদের গানে, যার উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন। এ তো গেল ভাষার কথা, বিষয়-নির্বাচনেও মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ। সুকুমার সেন লিখেছেন, "হিন্দু কবিরা প্রধানত দেব-মাহাত্ম্য-কাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন। বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনীর দিকে তাঁদের তেমন নজর ছিল না। হিন্দু কবিদের কাছে লৌকিক সাহিত্য ধর্মসাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল। কিন্তু মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের কোনো আবশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়েনি। সুতরাং দেবমাহাত্ম্য নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনী রচনায় তাঁরা নিরঙ্কুশ ছিলেন।' নবিবংশ বা জঙ্গনামা জাতীয় কিছু রচনা বাদে তাঁরা যে-সব লেখা লিখেছেন, তার মধ্যে রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যই বেশি এবং তার মধ্যে প্রচুর অ-মুসলিম চরিত্রও থাকত। শুধু তা-ই নয়, 'বরাবরই হিন্দু কবিদের তুলনায় এঁদের জনগণ সংযোগ নিবিড়তর ছিল। সুতরাং অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ) কাব্যপদ্ধতি উপেক্ষা করেন নি।' অতএব এ জাতীয় সাহিত্যকে যদি ইসলামি সাহিত্য বলতে হয়, তবে শুধু এই কারণে যে এর রচয়িতাগণ ছিলেন মুসলমান। তাকে সঙ্কীর্ণতা না মনে করাই উচিত কারণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ তথ্যটিও উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলার সর্বপ্রাচীন মুসলমান কবি কে, এ নিয়ে সংশয় আছে। বাংলাদেশের গবেষকদের চেষ্টায় যাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম নাম — আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মধ্যযুগের বহু প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বলেও দাবি করা হয়। কিন্তু এ দেশের বিদ্বানরা সেগুলির রচনাকাল সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেন নি কারণ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'আমরা এর অধিকাংশ পুঁথিই চাক্ষুষ করিনি।' সুকুমার সেনও সেই অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য তথা ভূমিকায়, 'বইটি বের হবার পর (— ফলে, বলছি না —) তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে, অধুনাতন বাংলাদেশে, এই সাহিত্যে গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা জেগেছে এবং তার ফলে অনেক নতুন লেখকের এবং নতুন রচনার আবিষ্কার হয়েছে। আমার এই গ্রন্থের কাঠামোয় সে-সব গবেষণার ফল ভরে দিতে পারিনি, তবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গবেষণার নির্দেশ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দ্বিতীয় সংস্করণের ও প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ছাড়া আর কোথাও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাম মেলে না। একে সুকুমার সেনের গ্রন্থের অসম্পূর্ণতাই বলা চলে।

কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে তিনি ইসলামি বাংলা সাহিত্যের রেখা টেনেছেন সপ্তদশ শতকের চাটিগাঁ-রোসাঙ্গা (অর্থাৎ আরাকান) থেকে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, রোসাঙ্গ দরবারের দুই সভাকবি দৌলত কাজি ও আলওল এই ধারার ভগীরথ। দৌলত কাজিকেই তিনি প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তবে তাঁকে শুধু ইসলামি কবি বলেই থেমে যান নি। 'পুরনো বাংলা

সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম' বলেও মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয়জন সম্পর্কেও তা-ই মত মুহম্মদ শহীদুলার, 'সৈয়দ আলাওল প্রাচীন বাঙ্গালা মুসলমান সাহিত্যের (লক্ষণীয় যে শহীদুল্লাহ ইসলামি সাহিত্য কথাটি ব্যবহার করেন নি) শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে যথেষ্ট হইবে না। বাস্তবিক তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দু-কবিদের সহিত তুলনায়ও একজন উচচপদস্থ কবি ছিলেন বলিতে হইবে।' শ্রেষ্ঠত্বের বিচার ব্যক্তিগত চি এবং ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু দুই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দ্বিমত দেখে বে াঝা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রায় সমসাময়িক এই দুই কবি কত বড়ো মাপের ছিলেন। দৌলত কাজির কবিতায় এই ভাষার ঐর্য মুগ্ধ করে —

কি কহিব রূপের প্রসঙ্গ
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।
কাঞ্চনকমল মুখ পূর্ণশশী নিন্দে
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে।
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে
মৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে।

এর ভাব ও ভাষায় কি একটু ইসলামি ছাপ আছে?

অতীতের মুসলমান কবিরা শুধু হিন্দু নায়ক-নায়িকা নিয়ে রোমান্টিক কাব্য-কাহিনীই রচনা করেন নি, কেউ কেউ হিন্দু ধর্মীয় বিষয় নিয়েও লিখেছেন। মুসলমান বৈষ্ণবকবিদের রচনা তো যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এই বইয়ে এঁদের কথা নেই বটে, কিন্তু সুকুমার সেনের 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে এঁদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক আলোচিত, সেই সৈয়দ মর্তুজার লেখা গান অ াছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সতেরো শতকের একজন কবির কথাও বলেছেন, যাঁর নাম ভবানী দাস। তিনি ময়নামতীর গান, র ামের স্বর্গারোহণ, লক্ষ্মনের দিগ্বিজয়, চণ্ডীর অনুবাদ ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছিলেন। শহীদুল্লাহ্‌র দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ভবানী দাস আসলে মুসলমান কারণ তাঁর লেখায় হিন্দু বিষয়ের মধ্যেও প্রচুর ইসলামি অনুষঙ্গ রয়েছে। 'গ্রন্থাকার যদি মুসলমান হইলেন, তাহা হইলে (১) তিনি হিন্দু-বিষয় লইয়া কেন লিখিতে গেলেন এবং (২) পুস্তক-মধ্যে ভবানী দাস — এই হিন্দু ভনিতা কেন আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি ঢাকা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ময়নাবতীর গান' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক নলিনীকান্ত ভট্টশালীর গ্রন্থস্থ ভূমিকার সাহায্য নিয়েছেন যাতে আছে — 'এই গ্রাম্য গাথাগুলির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ইহাতে যোগ দিত ও উপভোগ করিত। দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত 'গোপীচঁ াদের সন্ন্যাস' আবদুল সুকুর মহম্মদ নামক মুসলমান কবির রচিত।

আমাদের ছেলেবেলা দেখিয়াছি, আমাদের বাড়ির নিকট মনসার ভাসান-গানের কতকগুলি দল ছিল। তাহাদের সমস্তই মুসলমানের গঠিত এবং গায়কও সবাই মুসলমান।'

এর উল্টোটাও দেখিয়েছেন সুকুমার সেন। যেমন হিন্দু কবির মুসলিম গু। 'তাহেদ মামুদ গু শমস-নন্দন/তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।' 'সত্যপীরের পাঁচালির মধ্যে বৃহত্তম ও বিচিত্রতম উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণহরি দাসের রচনা।' কৃষ্ণরাম দাসের র ায়মঙ্গল কাব্যে সুকুমার সেন লক্ষ্য করেছেন, হিন্দু কবির লেখায় ইসলামি ঢঙ অর্থাৎ আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের বাহুল্য (এটা মুসলমান কবিদের পরের দিকের ঝোঁক এবং কিছু কিছু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল)। ভারতচন্দ্র এবং রামমোহন ওই অঞ্চলের মানুষ ছিলেন বলে তাঁদের লেখাতেও তথাকথিত ইসলামি বাংলার প্রভাব পড়েছে, এ কথা সুকুমার সেন বলেছেন। এই বিনিময় ছিল অনিবার্য। যেরকম হিন্দুর পুরাণ-পাঁচালিরও প্রভাব আছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর নবীবংশ ও জঙ্গনামা জাতীয় কাব্যে। সুকুমার সেন লিখেছেন, 'ইসলামি ধর্মের পুরাণ-পাঁচালি পেয়েও মুসলমান জনসাধারণ বাংল া-সাহিত্যের সাধারণ ধারাকে বর্জন করে নি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে যেমন অষ্টাদশ শতকেও তেমনি রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী অত্যন্ত চিকর ছিল হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে।' অপরদিকে, 'হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পীর-পীরানীর মাহাত্ম্য-কাহিনীতে ঢালাই করবার প্রচেষ্টা প্রকট হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে।' আরব-ইরানের পুরে ানো রোমান্টিক গল্পকাহিনীর অনুবাদ বা পুনর্নির্মাণ শু হয়েছিল বাংলার ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে। হাতেমতাই,

অলেফা-লায়লা, গোলে-বকাওলি, ইউসুফ-জুলেখা, লায়লা-মজনু, শাহানামা, চাহার দরবেশ ইত্যাদি নামধারী নানা বিচিত্র কাহিনী গদ্য ও পদ্যে তখন লেখা হয়েছে যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রোতা-পাঠকদের প্রিয় ছিল।' শুধু তা-ই নয়, 'ইসলামি বাংলা কাহিনীকাব্যে মুসলমান প্রকাশকদেরই একচেটে ছিল না, হিন্দু প্রকাশকেরা এতে সমান উৎসাহী ছিল।' অতএব দেখা গেল, যাকে ইসলামি বাংলা সাহিত্য বলা হয়, তা বিষয় বা শৈলী বা পাঠক-আকর্ষণ কোনও দিক দিয়েই মুসলমানের একচেটিয়া ছিল না কখনও।

সুকুমার সেন যে এর ইসলামিত্ব বা মুসলমানত্বের ওপর জোর দিয়েছেন, সেটা একে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য হিসেবে দেখানোর জন্য নয়, বাংলা সাহিত্য যে শুধু হিন্দুর নির্মাণ নয়, এই তথ্যকে তুলে ধরার জন্যই। একদম তন্নিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তিনি। কোনও রকম বিদ্বেষ বা চাপা সাম্প্রদায়িকতা উঁকি দেয়নি তাঁর লেখায়, আবার সম্প্রীতির নীতিকথাও শোনাতে বসেন নি। মুসলমান কবির হিন্দুধর্ম প্রীতি দেখে আদ নেই যেমন কোথাও, তেমনি মুসলমান সংস্কৃতির মান বা চি নিয়ে নেই কোনও কটাক্ষ। অপিচ, বিষয় ও বিষয়ীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আবেগের চোটে অতিরিক্ত পোষকতাও দেখান নি। তবে ঠিক গবেষণাগ্রন্থ লেখার মতো করে তিনি লেখেন নি এই বই। পাদটীকা আছে খুব অল্প পরিমাণে — প্রায় না থাকার মতোই, গ্রন্থপঞ্জি বাদই দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য, 'প্রস্তুত বইটিকে সাধারণের পাঠযোগ্য করতে চেষ্টা করেছি।' আর সেই জন্যই একজন বিশেষজ্ঞ না হয়েও এ বিষয়ে কিছু লিখতে পারলাম।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com